অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 06-15
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

নদিয়া জেলার লোকধর্ম সম্প্রদায়

রাকিবুল হাসান বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় যে-সব ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে বা তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা বাংলার লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির ভিত্তিভূমি। কেননা, মুখ্য ধর্মগুলির উদ্ভব কিংবা অনুপ্রবেশের পর কালক্রমে প্রায় প্রতিটি ধর্মই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং তার প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন লোকধর্ম এবং তার সম্প্রদায়। সহজিয়া মতের উৎপত্তির মূলে বৌদ্ধ ধর্ম। পরবর্তীকালে এই সহজিয়া ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের যে শাখাটি উদ্ভূত হল, তা হল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। অতঃপর এল ইসলাম ধর্ম এবং তার হাত ধরে এল সুফিবাদ। তারও প্রভাব পড়ল তৎকালীন বাংলার ধর্ম ও দর্শনে। সেও সহজিয়া, শাক্ত প্রভৃতি প্রচলিত ধর্মমতের প্রভাবে তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করল নব নব মতবাদ, নব নব সম্প্রদায়।

(১)

একসময় নদিয়া জেলা ছিল লোকধর্ম সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকধর্মের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। মূলত চৈতন্যদেবের সময় থেকেই নবদ্বীপ ও তার আশেপাশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে এবং চৈতন্য-পরবর্তী সময় থেকে বৈষ্ণবদের প্রেমধর্মের সাথে বৌদ্ধদের সহজযানের আদর্শ, তন্ত্রসাধনা এবং মুসলমানদের সুফিবাদের সমন্বয়ে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত ঐতিহ্য গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। বিধিনির্বন্ধ ধর্মের পরিবর্তে সহজ প্রেমের ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে নদিয়া জেলাতেই উদ্ভূত হয় বাউল, কর্তাভজা, আউল, বলরামী, সাহেবধনী, খুশি-বিশ্বাসী প্রভৃতি উপধর্ম বা লোকধর্ম সম্প্রদায়। নিম্নে এই সকল ধর্ম সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- **বাউল সম্প্রদায়:**

অক্ষয় কুমার দত্ত মনে করেন ‘বাউল’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘বাতুল’ শব্দ থেকে। তিনি জানান, ‘বাউল’ শব্দটি একটি প্রাকৃত শব্দ। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে প্রাকৃতে শব্দ-মধ্যস্থিত ‘ত’-কার লুপ্ত হয়ে বাতুল শব্দটি এমন রূপ ধারণ করেছে (বাউল>বাতুল)। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই মত সমর্থন করেন। ‘বাউল’ শব্দটি মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে’ অর্থাৎ পনেরো শতকের শেষের দিকেই লক্ষ করা যায়। পরে ‘চৈতন্য ভাগবত’, ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ প্রভৃতি গ্রন্থেও ‘বাউল’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে উপেন্দ্রনাথ মহাশয় মনে করেন যে, “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাউল শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে নাই।”[১]

পূর্বে বাউল শব্দটির দ্বারা যোগ-মার্গাবলম্বী সকল সাধুকে বোঝানো হতো। এঁদের ধর্ম ছিল শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত ধর্মসাধনা। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে 'বাউল' একটি বিশেষ মাত্রা পায়। বৈষ্ণব-সহজিয়া-তন্ত্র-সুফি প্রভাবিত লোকধর্মগুলির একটি অংশে পরিণত হয়। কুমুদনাথ মল্লিক বাউল সম্প্রদায়ের উৎস সন্ধান প্রসঙ্গে সম্পর্কে বলেছেন, "এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়া জেলা। হরিগুরু বনচারি সেবা কমলিনী ও অখিল চাঁদ এই চারিজন ফকিরকে ইহারা আপনাদের মত প্রবর্তক বলিয়া থাকেন। ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহাদের মতে এই নরদেহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই বিদ্যমান আছে। চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, গোলক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে।... এই কারণে তাঁহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া খ্যাত।"২

বাউলেরা মনে করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মভাবে মানবহৃদয়ে বিদ্যমান আছে। তাই অন্যত্র নয়, নিজ দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি প্রেম নিবেদনেই সাধনা পরিপূর্ণ হবে। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের প্রেমেতেই সে প্রেম পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। তাই প্রকৃতি সাধনাই এঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। এই সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ সে বিষয়ে জানতে পারে না। এ-বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সাবধান। কুমুদনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, "ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাহ্যিক বেশভূষা ও আচারাদি বিশেষ লোকাচার বিরুদ্ধ নহে। ইহাদের বেশ পরিধানে ডোর, কৌপিন ও বহির্ব্বাস, গাত্রে খেল্কা পিরাণ ও আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্রে প্রস্তুত। স্কন্ধে ঝুলি, হস্তে বক্র ষষ্টী ও কিস্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, যাহা কাঁচ, প্রবাল, পদ্মবীজ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহারা ক্ষৌর কর্ম্ম করে না; এবং কেশ ও শশ্রু ও ওষ্ঠলোম যত্নে রক্ষা করে এবং মস্তিষ্কের কেশ উন্নত করিয়া একটী ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে। অনেকে আবার পায়ে ঝাঁঝ্ ও হস্তে গোপীযন্ত্র লইয়া দেহতত্ত্ব ও নায়িকা সাধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান। এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলেও বহুতর সাম্প্রদায়িক সাঙ্কেতিক কথা সন্নিবেশিত থাকায় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ করা সুকঠিন।"৩

বাউল সাধনার একটি ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হলো এই বাউল গান। বাউল সম্প্রদায়ীরা গানের মাধ্যমে বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের সাহায্যে নিজেদের সাধন-ভজনের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। লালন শাহের হাত ধরে সমগ্র বাংলায় বাউল গান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। লালন শাহ ছিলেন একজন মরমী বাউল সাধক এবং অতি উচ্চাঙ্গের লোককবি। তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে নদীয়া জেলার কুমারখালী থানার অন্তর্গত ভাড়রা গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাধনা, গীত এবং অর্জিত তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউল সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি ও দেহতাত্ত্বিক বর্ণনা লালনের গানের দার্শনিক ভিত্তি। গুরু প্রশস্তি, গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ, দেহতত্ত্বের বর্ণনা, মনের মানুষের স্বরূপ ও লীলা খেলার বর্ণনা, সাধনের নানা পদ্ধতির ইঙ্গিত, সাধনের কাঠিন্য ও সে-বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের কথা, সাধনার পুণ্যফলের স্বরূপ প্রভৃতি লালনের গানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। অসাম্প্রদায়িক ও অবিভক্ত মানবতাবাদের প্রচার সাধন এ গানের উদ্দেশ্য। লালনের গানে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এক ঈশ্বর এবং সকল মানবের অভেদ কল্পনা—এই বিশ্বজনীন বাণীই লালনের গানের, তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। ড. আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'লালন শাহ' গ্রন্থে বলেছেন যে, লালনের গানে ধর্ম-সমন্বয়, আচার সর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদ ও ছুঁৎ-মার্গের প্রতি ঘৃণা, অসম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

যাই হোক, লালন ফকির ছাড়াও শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাঞ্জুশাহ, পদ্মলোচন, দুদ্দু শাহ, পাঁচু, চণ্ডী গোঁসাই, রশীদ, হাউড়ে গোঁসাই, গোপাল গোঁসাই, ফুলবাসুদ্দিন, ঈশান, বাখের শাহ, এরফান শাহ, সৈয়দ শাহনুর, মিয়াধন, শীতলং শাহ, আতর চাঁদ, তিনু, শ্রীনাথ, শেখ কিনু, কাঙাল হরিনাথ, রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ বাউল কবিদের নাম ছিল জনপ্রিয়।৪

• কর্তাভজা সম্প্রদায়:

নদিয়া জেলার কাছে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ। রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আউলচাঁদ নামে এক উদাসীন এই কর্তাভজা ধর্মের প্রবর্তক।৫ শোনা যায়, আউলচাঁদ উলা, খোলাদুবুলি প্রভৃতি গ্রামকে দীক্ষিত করে অবশেষে ঘোষপাড়ায় রামশরণ পালকে দীক্ষিত করেন। কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া-কাহিনী'তে জানিয়েছেন, "এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাঁদ। তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন।... আউলচাঁদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কয়টি প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালী প্রভু, গোঁসাই ও কর্ত্তা। এতন্মধ্যে আবার কর্ত্তা নামটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। "কর্ত্তা" অর্থ ঈশ্বর, যিনি এই জগতে স্রষ্টা, পোষ্টা ও হন্তা সুতরাং কর্ত্তা এবং তাঁহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা কর্ত্তাভজা।"৬

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধকগণ মনে করেন যে, মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে তিরোহিত হওয়ার পর পুনরায় রূপান্তর ধারণ করে আউলচাঁদ রূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের মধ্যে এই আউলচাঁদও একটি। অর্থাৎ চৈতন্যদেব যেমন বিষ্ণুর অবতার, তেমনি আউলচাঁদও বিষ্ণুর অবতার। তবে অক্ষয় কুমার দত্ত মনে করেন যে, 'আউলে' নামটি সম্ভবত মুসলমানদের দেওয়া; কেননা, পারসিক শব্দ 'আষ্টলিয়া' থেকে আগত 'আউল', যার অর্থ "যাহার দৈবশক্তি আছে"। সে যাই হোক, এই সম্প্রদায়ীরা আউলচাঁদকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন এবং চৈতন্যদেবের সাথে অভিন্ন বলে স্বীকার করেন।

আউলচাঁদের তিরোভাবের পর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভাঙ্গন শুরু হয়। চাকদহ থানার অধীন ঘোষপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রামশরণ পালের নেতৃত্বে আবার সকলে সমবেত হন। রামশরণের পর তাঁর স্থান অধিকার করেন তাঁর পুত্র দুলালচাঁদ। ভক্তগণের বিশ্বাস আউলচাঁদই পুনরায় দুলালচাঁদ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাছাড়া রামশরণ পালের সহধর্মিনী কর্তাভজাদের কাছে সতীমা নামে খ্যাত। তাদের ধারণা সতীমা পরমা প্রকৃতি যোগমায়া।৭

কর্তাভজাদের সাধনপ্রণালীর মধ্যে গুরুর প্রাধান্য খুব বেশি। তাঁরা গুরুর নির্দেশিত পথে চলেন এবং গুরুকে আরাধ্য দেবতা রূপে পূজাও করেন। গুরুকে তাঁরা 'মহাশয়' নামে আখ্যায়িত করেন এবং শিষ্যদের বলা হয় 'বরাতি'। মহাশয়গণ শিষ্যকে যে বীজমন্ত্র প্রদান করেন, তাকে বলা হয় 'গুরুসত্য' মন্ত্র। এঁদের মধ্যেও কিছু কিছু সাংকেতিক বাক্যের প্রচলন দেখা যায়, যার দ্বারা তাঁরা নিজেদের মধ্যেকার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন যে, একমাত্র বিশ্বকর্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম। কিন্তু তাঁরা "লোকমধ্যে লোকাচার, সদগুরুর মধ্যে একাচার"— এই বাক্য অবলম্বন করে বহুবিধ দেব-প্রতিমারও অর্চনা করেন।

নদিয়া জেলার লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাউল সম্প্রদায়ের পর সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল এই কর্তাভজা সম্প্রদায়। এখনও প্রতিবছর দোলপূর্ণিমার সময় ঘোষপাড়া গ্রামে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় বহু হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকির সমবেত হয়। বৃহত্তর বাউল সমাবেশের দিক থেকে বীরভূমের কেঁদুলি মেলা এবং কল্যাণীর ঘোষপাড়া মেলা বিখ্যাত। এই মেলায় কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকও পাওয়া যায়। তবে সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশই প্রচলিত কিংবদন্তিতে ভরপুর এবং তথ্য ও যুক্তিহীন ভক্তির কথাই বেশি করে উল্লিখিত হয়েছে।

• সাহেবধনী সম্প্রদায়:

সাহেবধনীদের সম্পর্কে প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় অক্ষয় কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। গ্রন্থটিতে অক্ষয় কুমার মহাশয় জানিয়েছেন যে, নদিয়ার কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত

শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের বনাঞ্চলে একজন উদাসীন বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল সাহেবধনী। হিন্দু মতাবলম্বী কয়েকজন ও একজন মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিলেন। উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলে পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় সাহেবধনী।

সাহেব পিরের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দোগাছিয়া নিবাসী মুলিরাম পাল। তাঁর হাত ধরেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মতাদর্শ বিস্তার লাভ করে। মুলিরাম পালের মধ্যমপুত্র শ্রীচরণ পাল এই সম্প্রদায়কে আরও সুসংগঠিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁদের সাধনার আসন দোগাছিয়া গ্রামের পূর্বদিকে জলঙ্গীর অপর পাড়ে বৃত্তিহুদা গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে বৃত্তিহুদা গ্রাম সাহেবধনীদের কেন্দ্রীয় সাধনপীঠ হিসেবে খ্যাত হয়। বর্তমানে পাল পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সুশীল পালের পুত্র শ্রীঅমলেন্দু পাল এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপদ্মপলাশ পাল যৌথভাবে সম্প্রদায়কর্তা রূপে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কার্যনির্বাহ করে চলেছেন।

সাহেবধনীদের সাধনতত্ত্বের অন্যতম বিষয় হলো দেহতত্ত্ব। এই দেহসাধনা বৌদ্ধ-তন্ত্র-যোগাচার থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলিকে আচ্ছন্ন করেছে। এই সকল লৌকিক সম্প্রদায়গুলি সমাজের অতি সাধারণ, নিরক্ষর জনজাতি কর্তৃক গড়ে উঠলেও তাদের ধর্মীয় সাধনপদ্ধতিতে কিছু গুহ্য, দুরূহ সাধনার প্রচলন দেখা যায়। এইরকম গুহ্যসাধনা বিশেষত দেহসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য প্রয়োজন সদ্গুরুর নির্দেশ, সৎসঙ্গ। এছাড়া এখানে নারীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে সাধনা করার রীতি রয়েছে, যাকে মিথুনাত্মক সাধনা বলা হয়। এই মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা সাধক ছয় রিপুকে ধ্বংস করে যে ভাবলোকে উন্নীত হয়, সেখানে থাকে কামনা-বাসনাহীন প্রশান্তি ও আনন্দের স্তর। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা'।

সাধারণত সনাতন ধর্মের আচার-বিচার, তত্ত্বকথা লিখিত থাকে তাঁদের শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে। লোকধর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনো লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সম্প্রদায়ে কিছু হাতে লেখা পুঁথি পাওয়া গেলেও সেগুলি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পায়নি। সাহেবধনী সম্প্রদায়েরও কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁদের ধর্ম সংক্রান্ত আচারবিধি সবই মুখে মুখে প্রচলিত। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায়, লোকধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর। তাছাড়া বিষয়টি এমনও ছিল না যে কেউ গুরুর কথা লিখে রাখবেন। কেননা তাঁদের সাধ্য-সাধন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তাই লেখার দিকে না গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে প্রহেলিকাময় ভাষায় গান রচনা করে তার মধ্যে সাধনপদ্ধতির নিয়মবিধিকে অক্ষয় রাখার চেষ্টা করেছেন। কুবির গোঁসাই ছিলেন সাহেবধনীদের প্রধান গান রচয়িতা, গায়ক ও সাধক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকালে প্রায় সাড়ে বারোশো গান রচনা করেছেন। এছাড়া ছিলেন যাদুবিন্দু ও রামলাল ঘোষ প্রমুখ কুবিরশিষ্য। তাঁদের এইসকল সংগীতগুলি সাহেবধনীদের সাধনার গোপন প্রণালীকে ব্যক্ত করেছে; কিন্তু আজও তা অধিকাংশ অব্যক্ত রয়ে গেছে। কেননা সেসব সংগীতের মর্মার্থ উদ্ধার করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। পাশাপাশি সেইসব গানের সুরের মধ্যে রয়েছে আকুল করা প্রাণের স্পর্শ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি। আর তার ফলেই যুগ-যুগান্তর ধরে গানগুলি লোকমুখে প্রচারিত থেকে সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও দর্শনকে চির অক্ষয় করে তুলেছে।

- **আউল সম্প্রদায়:**

আউল সম্প্রদায় কর্তাভজা সম্প্রদায়েরই একটি শাখা বিশেষ। অক্ষয় কুমার দত্ত জানিয়েছেন যে, এঁদের অপর নাম সহজ কর্তাভজা। এ-সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, "দত্ত মহাশয় আউল নামে যে সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়াছেন, সেরূপ সম্প্রদায় কোথাও আছে বলিয়া জানিনা।..... বর্তমানে মুসলমান বাউলদের মধ্যে কোনো কোনো সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। তাহাদের গুরুরা আওলিয়া নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন তত্ত্ব-দৃষ্টি সম্পন্ন উচ্চাঙ্গের সাধক। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহারা দীক্ষা গ্রহণ

করিয়াছে, তাহারা ঐসব আউলিয়াদের শিষ্য বলিয়া নিজেদেরও 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ আউলিয়াদের কয়েকটি গুরুপীঠ আছে। এই গুরুপীঠকে 'গদি' বলে।..... ইহাদের মতবাদ বা সাধন-পদ্ধতিতে বাউলদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। আউল বা আউলিয়া বর্তমানে বাউলদেরই নামান্তর।"৮

কুমুদনাথ মল্লিক অবশ্য 'নদীয়া-কাহিনী' গ্রন্থে আউলদের কর্তাভজাদের শাখা হিসেবেই স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই; সকল জাতি একসঙ্গে পানাহার করেন। 'প্রকৃতি' অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনী নিয়ে সাধনা করা এঁদের উপাসনার একটি অঙ্গ। একেকজন সাধক পুরুষদের সঙ্গে অনেকগুলি 'প্রকৃতি' অর্থাৎ সাধনসঙ্গিনীও থাকতে দেখা যায়। এঁদের মন নিতান্ত উদার; এমনকি একের সাধনসঙ্গিনী অন্যের নিকট গেলেও কখনও ঈর্ষা করেন না। এঁদের মধ্যে নানাপ্রকার গুহ্যসাধনা প্রচলিত আছে কর্তাভজাদের মতোই।

- **বলরামী সম্প্রদায়:**

সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম হাড়ি। তিনি আঠারো শতকের শেষের দিকে নদিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার মালোপাড়া গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে উদাসীন হয়ে যান এবং বলরামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। বলরাম প্রবর্তিত এই বিশেষ সম্প্রদায়টি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন বলরামী, বলরাম ভজা, বলরামচন্দ্রের ধর্ম, বলাহাড়ির মত, হাড়িরাম সম্প্রদায় ইত্যাদি।৯

বলরামি সম্প্রদায়ের পূর্ব প্রবর্তক বলরাম হাড়ির পদবী দেখেই বোঝা যায় এই সম্প্রদায় অন্ত্যজ বর্গের মধ্যে প্রচারিত। এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম জানা যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২৬ ফাল্গুন, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায়। পরবর্তীকালে অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র প্রথম ভাগে বলরামের আরেকটু বিস্তারিত পরিচয় দেন।

বলরাম হাড়ির শিষ্যরা তাঁকে রামচন্দ্র বলে বিশ্বাস করেন। বলরাম হাড়ি ছিলেন বাকচতুর। তাঁর সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। দোল উৎসবে বলরাম নিজে বিগ্রহ সেজে বসতেন এবং ভক্তদের পূজা নিতেন। বলরাম সর্বদা তাঁর শিষ্যদের সত্য ব্যবহার করতে বলতেন। ভৈরব নদের তীরে এদের আখড়া ছিল বলে শোনা যায়। বলরাম সম্প্রদায়ীরা গুরুর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করেন। এদের ধর্মে চৌর্য্য, লাম্পট্য, মিথ্যা কথন এবং বিষয়শক্তি পাপ বলে ধরা হয়। এঁরা জাতপাত মানেন না। ভিক্ষাবৃত্তিই বলরামী সম্প্রদায়ী সাধকদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। তাছাড়া এঁরা কোনোরকম পীড়া হলে ওষুধও খান না। মৃত্যুর পর অন্তেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও করেন না।

- **খুশি-বিশ্বাসী সম্প্রদায়:**

নদিয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্তী ভাগা নামক একটি গ্রামে খুশি বিশ্বাস নামক এক মুসলমান খুশি-বিশ্বাসী ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধকরা খুশি বিশ্বাসকে চৈতন্যদেবের অবতার স্বরূপ জ্ঞান করেন। তবে পরমেশ্বরের সাকার রূপ অস্বীকার করেন না। এঁরা অন্যান্য উপধর্ম সম্প্রদায়ের মতো জাতপাত ভেদাভেদ করেন না। সকল জাতি মিলিত হয়ে একত্রে পানাহার করেন। এঁদের আচরণকে 'বিশ্বাস' বলা হয়। কর্তাভজাদের মতো এঁরাও পীড়িত লোকেদের দৈব ওষুধ দিয়ে থাকেন। রোগ নিরাময়, নিঃসন্তানের সন্তান-সহ শিষ্যদের নানাবিধ মনোবাঞ্ছা পূরণ উদ্দেশ্যে কাগজ কিংবা গাছের পাতায় আরবি অক্ষরে 'জটী সার নাম' লিখে তাবিজ-কবচ দিয়ে থাকেন।১০ বর্তমানে এই সম্প্রদায় অবলুপ্তপ্রায়। কর্তাভজা-বাউল সম্প্রদায়ের মতো খুশি-বিশ্বাসীদের কোনো গীত পাওয়া যায় না। এঁদের অবলুপ্তির প্রধান কারণগুলির মধ্যে এটিও অন্যতম। কেননা

গানের মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন প্রচারিত হয়; মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। মানুষ সমবেত হয়; ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু খুশি-বিশ্বাসীরা পরবর্তীকালে মানুষকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

• **বদন বিশ্বাসের ঘর:**

অষ্টাদশ শতকে নদিয়া জেলার চাপড়া জনপদের অন্তর্গত ডোমপুকুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বদন বিশ্বাসের ঘর' নামক একটি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বদন বিশ্বাস। তাঁর আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার আনন্দবাস গ্রামে। পরে তাঁরা সেখান থেকে ডোমপুকুরে স্থানান্তরিত হন।

'বদন বিশ্বাসের ঘর' সম্প্রদায়ের ভাবধারায় সুফিদর্শন প্রভাবিত। তাছাড়া সহজিয়াদের দেহবাদের প্রভাবও রয়েছে। বদন বিশ্বাসের পুত্র আব্দুল বিশ্বাস রচনা করেছেন এই সম্প্রদায়ের ভাবধারার অসংখ্য পদাবলী। আব্দুল বিশ্বাসের শিষ্য বিখ্যাত ফকির পাঁচু শাহ প্রতিষ্ঠিত ফকিরি আখড়ার খ্যাতি এখন আন্তর্জাতিক। চাপড়া জনপদের বিশিষ্ট গবেষক মোশারফ হোশেন মহাশয় বিভিন্ন গায়কের মুখ থেকে আব্দুল বিশ্বাসের শতাধিক গান সংগ্রহ করেছেন। মোশারফ হোশেন জানিয়েছেন, "আব্দুল বিশ্বাসের তিন পুত্র— ১) মিয়াজান বিশ্বাস, ২) হুজুর বিশ্বাস, ৩) ইয়াদালি বিশ্বাস এবং এক কন্যা তপস্বী পূর্ণভাবে ফকিরি ধর্ম অবলম্বন করে বদন বিশ্বাসের মত ও পথকে প্রচারের দায়িত্ব নেন।"[১১] তাই পরবর্তীকালের ফরাজী ও ওয়াহাবী নামক ইসলামী বিশুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের চাপে পড়েও, স্বাধীনতা পরবর্তী শরিয়তপন্থীদের তীব্র সামাজিক চাপে পড়েও এ বঙ্গে ও বর্তমান বাংলাদেশের নানা জেলায় বদন বিশ্বাসের সাধনপদ্ধতি শিষ্য পরম্পরায় আজও সমাজের মধ্যে তাঁর মরমী সাধন-ভজনের আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছে।

(২)

এ পর্যন্ত নদিয়া জেলায় উদ্ভূত বিভিন্ন লোকধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে, তাদের উদ্ভব, বিকাশ, মতবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলো। নিম্নে এইসকল ধর্ম সম্প্রদায়গুলির আচার-বিচার, সংস্কার-দর্শন, সাধনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:

প্রায় প্রতিটি লোকধর্মের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ওই সকল ধর্ম প্রবর্তনের সূচনায় কোনো-না-কোনো মুসলমান ফকিরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কর্তাভজাদের আউলচাঁদ, সাহেবধনীদের সাহেব পিরের কথা বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অন্ত্যজ মানুষেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু তারা যখন দেখল যে, এইসব অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ফকিরেরা ব্রাহ্মণ নয়, তখন তাদের মধ্যে যে হীনমন্যতা ছিল তা আত্মবিশ্বাসে পরিণত হলো এবং শাস্ত্রীয় ধর্মাচার ত্যাগ করে কিংবা তার সঙ্গে যুক্ত থেকেও তারা উদারনৈতিক লোকধর্মের প্রতি আকর্ষণবশত ধর্মান্তরিত হয়ে নিজেদেরকে সংকীর্ণ ধর্মাচারের শিকল থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলো।

সুতরাং লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা মোটামুটিভাবে প্রায় একইরকম। তবে আচার-আচরণগত দিক থেকে অনেক সময় তারা ভিন্ন পথে চালিত হয়েছে। সাহেবধনীদের সাধকেরা প্রকৃতপক্ষে গৃহী। তাঁরা বাউল ফকিরদের মতো আলখাল্লা কিংবা সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতো ভেকধারণ করেন না। তবে কর্তাভজের সম্প্রদায়েও যে-সব আচার পালিত হয়, তা সহজ, সরল এবং গৃহীলোকের পক্ষে পালনীয়। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের যেমন বৃহস্পতিবার উপাসনার দিন বা সাপ্তাহিক ধর্মীয় বার, কর্তাভজাদেরও তেমনি ধর্মীয় বার হলো শুক্রবার। এই শুক্রবারে কোনো ভক্ত আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন না। সন্ধ্যার পর তাঁরা সমবেত হয়ে

.

'ভাবের গান' করেন এবং উপাসনায় মশগুল হন। কর্তা-মার বিশেষ ভোগ হলো মাখা সন্দেশ। উপাসনান্তে সকলে হিমসাগরের জলে দাঁড়িয়ে ওই প্রসাদ গ্রহণ করেন।১২

কর্তাভজাদের মতো সাহেবধনীদেরও দেহের 'খাজনা' দেওয়ার রীতি রয়েছে। তাঁরা মনে করেন গুরুই দেহের মালিক। তাই দেহেতে বাস করতে হলে গুরুকে খাজনা দিতে হবে। গুরুভজনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। তবে বলরামী বা বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশপরম্পরায় গুরু থাকে না, যেমনটা সাহেবধনী-কর্তাভজাদের মধ্যে দেখা যায়। বলরামীরা সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তিকেই সকলের গুরু নির্বাচন করেন।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ে যেমন শিষ্যদের দীক্ষিত করেন তাদের 'আসুনে ফকির', তেমনি বলাহাড়ি সম্প্রদায়ে হাড়িরাম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন 'সরকার'। তবে সেখানে গুরুবন্দনার রীতি নেই। হাড়িরামীরা সকল মানুষের মধ্যেই স্বয়ং হাড়িরামের অধিষ্ঠানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। তাই তাঁরা মানুষভজনের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। সাহেবধনীরা মানুষভজনের কথা বললেও সেখানে গুরুসর্বস্বতা বা গুরুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য, বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুরুভজনার কথা রয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে বংশপরম্পরায় গুরু প্রতিষ্ঠার প্রথা নেই।

বলরামী বা বলাহাড়ি ধর্মে প্রধান আচরণীয় হলো সদাচার ও জিতেন্দ্রিয়তা; আর তা পালন করার জন্যই এঁরা নিজেদের নারী-ভাবে হাড়িরামের সাধনা করে থাকেন। এই নারী-ভাবে সাধনা করার রীতি সাহেবধনী সম্প্রদায়েও লক্ষ করা যায়। অগ্রদ্বীপের মেলায় আসুনে ফকির দীনদয়ালের ভোগ বা গোসলের পানি দেওয়ার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকেন। কিন্তু কর্তাভজা সম্প্রদায়ে এই রূপ কোনো রীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ভাবের গীতের আসরে বা সাধনার সময় পুরুষ-নারীর কোনো ভেদাভেদ রাখা হয় না।১৩

সাহেবধনী সম্প্রদায়ী সাধকদের মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা বা কবর দেওয়ার রীতি রয়েছে। সাধক কুবির গোঁসাইয়ের সমাধি রয়েছে বৃত্তিহুদা গ্রামে। কিন্তু এই রীতি বা হিন্দু সমাজে প্রচলিত দেহ পোড়ানোর রীতি বলরামী সম্প্রদায় মানেন না। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম হাড়ি মারা গেলে তাঁর পূর্ব নির্দেশ মতো শিষ্যরা তাঁর দেহ জঙ্গলে ফেলে আসে জীবিত প্রাণীদের খাবার হওয়ার জন্য। পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের সাধকদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়া কিংবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। বর্তমানে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতেই এঁদের সৎকার করা হয়।১৪

(৩)

বাউলদের প্রধান সাধনা হলো কায়াসাধনা। তাঁরা সন্তানজন্ম নিষিদ্ধ করে দেহবস্তুকে রক্ষা করেন। বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলে সেখানে স্বামী-স্ত্রী বলে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না। বাউল সাধকদের থাকে সাধনসঙ্গিনী। তাঁদের মধ্যে কোনো আন্তরিক টান বা প্রেম থাকে না। সেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি কেবল সাধনার প্রয়োজনেই মিলিত হয়। একে মিথুনাত্মক সাধনা বলা হয়। এই মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা সাধক ছয় রিপুকে ধ্বংস করে যে ভাবলোকে উন্নীত হয়, সেখানে থাকে কামনা-বাসনাহীন প্রশান্তি ও আনন্দের স্তর। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা'।

সাহেবধনী সাধক সাধনসঙ্গিনীর সাহায্যে মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা কামকে জয় করে মোক্ষলাভ করতে চান ঠিকই, তবে বাউলদের মতো এরূপ বিধিনিষেধ সাহেবধনী সম্প্রদায়ে নেই। তাঁরা একদিকে যেমন সাধক, অন্যদিকে তাঁরা গৃহীও। সংসারে থেকেও জাগতিক বস্তু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে ঈশ্বর অন্বেষণ করাই তাঁদের সাধনা। সাহেবধনী সাধক কুবির গোঁসাইয়ের জীবনচর্চা লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর স্ত্রীও ছিল, সাধনসঙ্গিনীও ছিল। কুবিরের স্ত্রীর নাম ছিল ভগবতী দেবী এবং সাধনসঙ্গিনীর নাম ছিল কৃষ্ণমোহিনী। বৃত্তিহুদায় কুবিরের সমাধির পাশেই তাঁদের সমাধি রয়েছে।১৫

কর্তাভজারা আবার নারীবর্জিত সাধনা করে কামকে জয় করতে চান। তাই সেখানে মিথুনাত্মক সাধনার স্থান নেই। এঁরা দেহের মধ্যেই নারী-পুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন একই দেহে নারী-পুরুষ উভয়ই বিদ্যমান এবং তাঁরা চিরসঙ্গী ও অভেদ। এদের মিলনই ভক্ত আর ভগবানের মিলন। সেজন্য তাঁদের সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে—"মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।" সম্প্রদায়ী লোকেরা পরস্পরকে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বোধন করে থাকেন।

বলরামী সম্প্রদায় গৃহী জীবনযাপন করলেও মিথুনক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। তাঁদের জগতে পুরুষ বলে আলাদা কোনো জাতি নেই। নারী-পুরুষ সকলেই নারী; একমাত্র হাড়িরামই পুরুষ। তাই সম্ভোগের বাসনা তাঁরা করেন না। কেবলমাত্র জন্মের প্রয়োজনেই স্ত্রীকে তাঁরা নারীরূপে দেখেন।১৬

সাধারণত সনাতন ধর্মের আচার-বিচার, তত্ত্বকথা লিখিত থাকে তাঁদের শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে। লোকধর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনো লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সম্প্রদায়ে কিছু হাতে লেখা পুঁথি পাওয়া গেলেও সেগুলি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পায়নি। লোকধর্মের যাবতীয় বিধি, সাধনপদ্ধতি মুখে মুখে প্রচারিত। কেবলমাত্র কর্তাভজাদেরই ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। অবশ্য তাকেও প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ বলা চলে না। কর্তাভজাদের সাধক দুলাল চাঁদ 'ভাবের গীত' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তার মধ্যেই সম্প্রদায়ের বিধিনিষেধ নির্দেশিত থাকায় সেটিকেই সম্প্রদায়ীদের আইনপুস্তক বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির প্রচার ও প্রসারের মূল আধার হলো তাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বলিত গান। এই গানের মাধ্যমেই সম্প্রদায় প্রসারিত হয়; প্রচারিত হয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শন। মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। এই গান উপলক্ষে মানুষ সমবেত হয়; ঐক্য গড়ে ওঠে। সাহেবধনীদের সাধনপীঠে প্রতি বৃহস্পতিবার গানের আসর বসে। এছাড়া তাঁরা প্রতিবছর অগ্রদ্বীপের মেলায় দুই রাত ধরে গানের অনুষ্ঠান করে থাকেন। কর্তাভজারাও প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর সমবেত হয়ে ভাবের গান করেন। তাছাড়া প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার সময় কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় তাঁদের বিরাট মেলা বসে এবং সেখানে বহু হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকির সমবেত হন।

বলরামী সম্প্রদায়ের মধ্যেও গানের প্রচলন দেখা যায়। নদিয়ার ডোমপুকুরের বদন বিশ্বাসের ঘর নামক সম্প্রদায়ও গানের দিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক হিসেবে আব্দুল বিশ্বাসের নাম উঠে আসে। তবে এ-বিষয়ে খুশি বিশ্বাসীরা ব্যতিক্রমী। নদিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো এঁদের কোনো গানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৪)

সুতরাং আচার-আচরণ, ধর্মীয় দর্শন, সাধনপদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করলে বাউল, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, কর্তাভজা প্রভৃতি লোকধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু-কিছু বৈসাদৃশ্য উঠে এলেও মূলগত দিক থেকে তাঁরা অনেকটা কাছাকাছি। তাঁদের সামাজিক লক্ষ্য একটাই এবং তা হলো অবক্ষয়িত সমাজের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা। সেজন্য প্রতিটি সম্প্রদায়েই শিষ্যদের চারিত্রিক পরিশুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ১ বৈশাখ, ১৪২৬ ব., পৃ. ৪৬

২. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া-কাহিনী, সাহিত্য-সভা, ১০৬/১, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৭, পৃ. ২৪২

৩. তদেব, পৃ. ২৪৩

৪. ড. আবদুল ওয়াহাব, বাংলার বাউল- সুফি সাধনা ও সংগীত, রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৯৯, পৃ. ১০৮-১০৯

৫. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম করুণা সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ ব., পৃ. ২২০

৬. কুমুদনাথ মল্লিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬

৭. ড. ননীগোপাল গোস্বামী, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, ১৩৭১ ব. পৃ. ১৭৮

৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৯. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম: সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ৪০

১০. অক্ষয় কুমার দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১১. ডা. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদনা), স্মরণিকা পত্রিকা, চাপড়া, নদিয়া-৭৪১১২৩, ত্রয়োদশ বর্ষ, ডিসেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২০

১২. রাজিব আহমেদ, কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়, আনন্দধারা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ১২৩

১৩. তদেব, পৃ. ১২৪

১৪. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৯০

১৫. নগেন্দ্রনাথ সূত্রধর (সম্পা.), ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে— কুবির গোঁসাই-এর সুনির্বাচিত একশত সংগীতের অঞ্জলি (প্রথম খণ্ড), কসমস প্রিন্টার্স, পাইওনীয়ার পার্ক, বারাসাত, কলকাতা-১২৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১৫

১৬. রাজিব আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

গ্রন্থপঞ্জি:

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২৬ ব.

২. নগেন্দ্রনাথ সূত্রধর (সম্পা.), ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে— কুবির গোঁসাই-এর সুনির্বাচিত একশত সংগীতের অঞ্জলি (প্রথম খণ্ড), কসমস প্রিন্টার্স, পাইওনীয়ার পার্ক, বারাসাত, কলকাতা-১২৪, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১০

৩. অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম করুণা সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ ব.

৪. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া-কাহিনী, সাহিত্য-সভা, ১০৬/১, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৭

৫. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বাংলার বাউল, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, নবযুগ সংস্করণ, পৌষ, ১৪১৬ ব.

৬. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৬

৭. ড. প্রবীর প্রামাণিক, নদিয়া জেলার লোকধর্ম, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১০

৮. রাজিব আহমেদ, কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়, আনন্দধারা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১

৯. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮

১০. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম- সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন,কলিকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩

লেখক পরিচয়:

লেখক রাকিবুল হাসান বিশ্বাস নদিয়া জেলার ধুবুলিয়ার অন্তর্গত কালিনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাস্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে স্টেট এডেড কলেজ টিচার (SACT) হিসেবে কর্মরত। এছাড়া বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মেদিনীপুর কলেজে (স্বশাসিত) গবেষণারত।

cc BY NC

.